Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 74-78
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

গৈরিক পতাকা: ইতিহাসের সাহিত্য

ড. সুশান্ত ঘোষ

ফেলো দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডন, অধ্যাপক, সরকারি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Sachindranathy Sengupta (known as Sachin Sengupta) was a very famous and prominent Bengali play writer and the producer and director of the contemporary theatrical plays in Calcutta of his period. Most of his play- 'Raktakamal', 'Rastrabirohi', 'Desher Dabi', 'Sirajdullah' etc. made for stage. His patriotic and nationalist sense assimilated into his literary work. His 'Gairik Pataka' –is a very famous patriotic drama wrote in preindependent India and it offered to world known Partiot of India Netaji Subhash Chandra Bose. The drama 'Gairik Pataka' wrote in a historical situation in preindepent India against British Raj. Maratha Raj Sivaji significantly releating with Netaji for his patriotism and nationalism. Gairik pataka is a symobol of sacrifice and brevity of India soul. Here we seeking historical significance of the Gairikpataka and successfulness as historical drama.

সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' একটি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক। নাটকটি নাট্যকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এবং মারাঠা সেনানায়ক শিবাজীর দ্বন্দ্ব অন্যতম প্রধান ঘটনা। এই দ্বন্দ্বের ঘটনা অবলম্বন করেই ২০শে আষাঢ় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩০) 'গৈরিক পতাকা' নাটকটি রচিত হয় এবং অভিনীত হয়। দেশবরেণ্য স্বাধীনতা প্রেমিক সুভাষচন্দ্র বসুর কারাবাসের উপর এটি রচিত হয় এবং এই স্বদেশচেতনা সমৃদ্ধ নাটকটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। নাটকের ভূমিকা অংশে তিনি সেকথা বলেছেন "১৩৩৯ সালে নাটখানি যখন প্রথম অভিনীত ও প্রকাশিত হয় নেতাজী তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। নাটকখানি তাঁহার জাতি সংগঠনের প্রয়াসের কথা রাখিয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া ছিলাম"। সুতরাং নেতাজীকে উৎসর্গ করার জন্য এই নাটকটিকে অত্যন্ত গভীর ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজতে হয়েছিল নাট্যকারকে। কেননা তিনি এই নাটকের মধ্যদিয়ে নেতাজীর সঙ্গে সমগ্র জাতিকে জাতীয় চেতনার বাণী বহন করে আনতে চেয়েছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে তাই ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর ঐতিহাসিক কাহিনিকে রূপকের আশ্রয়ে তুলে ধরে স্বদেশ চেতনার দিকটিকেই আলোকিত করেছেন।

ঔরঙ্গজেবের শাসন কালে (১৬৫৭-১৯০৭) মারাঠা শক্তি পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং শিবাজীর নেতৃত্বে মোঘল বাহিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাঁধে। আশৈশব শিবাজী বিশ্বাস করতেন মুসলমান শাসকদের অত্যাচার থেকে দেশকে উদ্ধার করে হিন্দুসাম্রাজ্য তৈরি করার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে মোঘল অধিকৃত

বিজাপুর দূর্গ আক্রমণ করেন এবং সেখানকার সেনাপ্রধান আফজল খাঁকে বিতারিত করে বিজাপুর দূর্গ দখল করেন। ফলে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মারাঠা রাজ শিবাজীর সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়। সেই সময় রাজপুত রাজা জয়সিংহ উভয়ের সম্পর্ককে মিত্রসুলভ করতে আগ্রহী হন। কিন্তু আবিশ্বাসী চক্রান্তলোভী ঔরঙ্গজেবের ছল বুঝতে পেরে আগ্রা দূর্গ থেকে রোমহর্ষক পন্থায় তিনি পালিয়ে আসেন। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে তার রাজ্যভিষেক হয়। এর মাত্র ছ' বছর পরে শিবাজীর ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ শিবাজীর এই কর্মময় জীবনই নাটকটির প্রধান কাহিনি। শিবাজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মজীবনকে কোথাও কোথাও মিলিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ও নাট্যকার ইতিহাসের তথ্যকে এককভাবে পরিবেশন করেননি, ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস নাটকের যে সহাবস্থান থাকে তাকেই তিনি প্রধান্য দিয়েছেন নাটকে। নিবেদন অংশে সে কথাই জানিয়েছেন পাঠককে "মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতি আজ তরুণ বাঙালির প্রাণে যে প্রেরণা এনে দেয়, তাই অবলম্বন করে আমি 'গৈরিক পতাকা' রচনা করলুম। ইতিহাস থেকে এর উপাদান নিয়েছি, ঐতিহাসিক ঘটনাও সংস্থাপন করেছি কিন্তু বাধ্য হয়ে ঐতিহাসিক পাত্র পাত্রীদের সকল নাম গ্রহণ করতে পারিনি,- কল্পিত চরিত্রের অবতারণাও করেছি।" মোটকথা তিনি ইতিহাসের নীরস কাহিনিকেই মূলতঃ নাটক রূপদান করেছেন। কেবল কল্পিত চরিত্রের অবতারণা করেছেন। কিন্তু নাটকটি গভীর ভাবে পাঠ করতে দেখতে পাই ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি ঐতিহাসিক চরিত্রও মূলতঃ ইতিহাসেরই অনুগামীতা করেছে। ফলে ইতিহাসই হয়ে উঠেছে এ নাটকের মূল উপাদান। যে নাটকে ইতিহাস ও মানবরস তুল্যমূল্য সহবস্থান করে এবং মানবধর্মের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয় তাকেই সাধারণভাবে ঐতিহাসিক নাটক বলা যেতে পারে। সে কারণে ঐতিহাসিক নাটকের স্পষ্ট দুটি দিক রয়েছে। এক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক তথ্য চরিত্র ব্যক্তিত্ব এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। দুই নাটক যেহেতু মানবজীবনের অনুকরণ তাই মানবজীবনে সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা ইত্যাদি মানসিক বিষয়গুলিও প্রাধান্য পাবে। ঐতিহাসিক নাটকের স্থান কাল পাত্রের ঐক্য থাকার একান্ত প্রয়োজনীয়তা না হলে কালানৌভিত্য দোষ Anachronism ঘটতে পারে। ইংরেজী নাটকে সেক্সপীয়ার এবং মার্লোর নাট্যকর্মের খ্যাতি অখ্যাতি মূলতঃ ঐতিহাসিক নাটকে অবলম্বন করেই। বাংলায় মধুসূদন দত্ত থেকেই যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক রচিত হতে থাকে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৯৬১) মোঘল রাজপুত দ্বন্দ্বের এক অশ্রুসজল কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। ঠাকুর পরিবারেও ঐতিহাসিক নাটক একদা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' ইত্যাদি নাটক ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বদেশী যুগে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। সিরাজদৌল্লা, অশোক, প্রভৃতি নাটকে ইতিহাসের কাহিনির সঙ্গে স্বদেশী যুগের উচ্ছ্বাস মিশিয়ে ঐতিহাসিক নাটকের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) দুর্গাদাস (১৯০৫) নূরজাহান (১৯০৮) মেবার পতন (১৯০৮) সাহাজাহান (১৯০৯) চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) শিল্পকর্ম ও জনপ্রিয়তার সুউচ্চ গগন স্পর্শ করেছে।

দ্বিতীয় একদল নাট্যকারের উদ্ভব হয়েছিল ত্রিশের দশকে যারা মূলতঃ ইতিহাসের কাহিনিকে নিয়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে নাট্যকার শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত প্রধান। যদিও মন্মথ রায় এর 'অশোক' একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে সেকালেও একালে পরিচিত হয়ে আছেন মহেন্দ্র গুপ্ত ঐতিহাসিক রচনায় অসাধারণ পারদর্শীতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'টিপু সুলতান' ৯৪৪ 'রানীভপবানী', 'রাণী দূর্গাবতী', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিংহ' প্রভৃতি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই সময়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাট্যকার। তাঁর 'গৈরিক

পতাকা' (১৯৩০) ছাড়াও 'সিরাজদ্দৌলা', 'ধাত্রীপান্না', 'আব্দুল হাসান', 'কামাল আতাতুর্ক', 'বাংলার প্রতাপ', 'রাষ্ট্র বিপ্লব' প্রভৃতি নাটক ইতিহাস ও নাটকের এক অপূর্ব সহাবস্থান ঘটেছে। অবশ্য শচীন সেনগুপ্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলির দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর 'রাষ্ট্র বিপ্লব' নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান' নাটকের পরিমার্জিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রতিভাও রীতিমতো বিস্ময়কর। তাঁর সেই বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় আছে 'গৈরিক পতাকায়'। একদিকে উজ্জ্বল দেশপ্রেম অন্যদিকে অতন্দ্র ইতিহাস নিষ্ঠা চেতনা, মানব জীবন মূল্যায়ণে- এটি ঐতিহাসিক নাটকের শীর্ষস্থানে বসার যোগ্যতা লাভ করেছে। 'গৈরিক পতাকা' একটি পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক। এই নাটক সেক্সপীরীয় নাট্য রীতিকে গ্রহণ করেছে। পাঁচটি অঙ্কে অনেকগুলি দৃশ্যে কাহিনি বিধৃত করেছেন। মারাঠা রাজ শিবাজী এবং তানাজীর কথোপকথনের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছে নাটকটি। শিবাজীর প্রধান সহচর তানাজীর কথায় মধ্য দিয়েই নাটকের মূল কথাটি তুলে দিয়েছেন নাট্যকার- "শিবাজীকে যারা জানে না, চেনে না, সমান্য জায়গীরদার বলে তারা তাঁকে উপেক্ষা করতে পারে; কিন্তু তানাজী জানে পতিত এই জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে যে শক্তি, তা বেড়ে উঠেছে শিবাজীকে আশ্রয় করে"। (প্রথম অঙ্ক ও প্রথম দৃশ্য)। সুতরাং পতিত প্রায় মারাঠাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার যে শক্তি যার মধ্যে আছে, সেই শিবাজীর জীবনযুদ্ধই এই নাটকের উপপাদ্য। শিবাজীও তাই বলেছেন- "হাঁ বন্ধু আমি রাজ্য চাই, নিজের ভোগের জন্য নয়, বংশ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, হিন্দু জাতিকে, মানব সভ্যতার বিশিষ্ট একটি ধারাকে সঞ্জীবিত অব্যাহত রাখার জন্য আমি চাই সম্পদ, আমি চাই শক্তি, আমি চাই পর প্রভুত্ব"। সুতরাং শিবাজীর কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাই নাটকটির মধ্যে প্রকাশিত। একটি নাট্যকারের উদ্দেশ্য বা Aim। শিবাজী রাজা হলেও গর্বহীন অমায়িক। জনতার মাঝে মিশে সকলের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করে এগিয়ে চলাই তার উদ্দেশ্য। শিবাজীর পিতা শাহাজীকে আদিলক সাহেব চক্রান্তে মোঘল সম্রাটের কাছে বন্দী হতে হয়। একথা ইতিহাস স্বীকৃত সত্য। নাট্যকারও সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি একনিষ্ঠ থেকে নাটকে তার প্রয়োগ করেছেন।

"পেশোয়া। .....প্রভু শাহজী আজ বন্দী।
শিবাজী। বন্দী! পিতা বন্দী!
পেশোয়া। হাঁ মহারাজ, রঘুনাথ সেই দুঃসংবাদই নিয়ে এসেছে।
শিবাজী। কে তাঁকে বন্দী করলে?
রঘুনাথ। বিজাপুর দরবার। মহম্মদ আদিল শাহের প্ররোচনায়,
বাজী ঘোড়পুরে বিশ্বাসঘাতকতা করেই প্রভুকে ধরিয়ে দিয়েছে।
শিবাজী। বাজী ঘোড়পুরে। পিতা যাকে ভাইয়ের মতন ভালোবাসতেন
রঘুনাথ। হাঁ মহারাজ, বিশ্বাসঘাতক সেই ঘোড়পুরে।"

ইতিহাসের সঙ্গে এই কাহিনি অভিন্নভাবে মিলে যায় আমাদের মনে হয় নাটক লেখার পূর্বে নাট্যকার দীর্ঘ সময় মোঘল মারাঠা ইতিহাস নিজভাবে অনুশীলন করেছিলেন। সেই অনুশীলনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে এই ঐতিহাসিক উপাদানের পরিবেশনের মধ্যে। এরপরই শিবাজী বিজাপুর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিজাপুর পিতার বন্দীকে কোনদিনই মানতে পারেনি মহাপরাক্রমী স্বাধীনচেতা শিবাজী। শিবাজীর এই ইচ্ছাকে আরও ইন্ধন দেয় তাঁর বিদূষী মাতা জিজাবাঈ। বীরপুত্রের কাছে এ কী বড় দুঃসংবাদ, যে সে তার কর্তব্য স্থির করতে অসমর্থ।

কথার একটু মারপ্যাঁচ থাকলেও জিজাবাঈ যে বীরপুত্রকে বিজাপুর আক্রমণের শপথ নেবার সংকল্প গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন তা বলা বাহুল্য। কিন্তু পরক্ষনেই জিজাবাঈ পুত্রকে আক্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তাঁর কাছে উদিত হয়েছে স্বদেশবোধ ও জাতীয় চেতনার অঙ্গীকার। তাই তাঁর কাছে কেবল শিবাজীর পিতাই বন্দী নয়। বন্দী সমগ্র ভারতবর্ষের নর নারী নির্বিশেষে সকলেই বন্দী। তাই কেবল পিতাকে নয়, সমগ্র বন্দী জাতিকেই মুক্ত করতে হবে শিবাজীকে। আর সেই কর্মের প্রেরণাদাত্রী তাঁর বীরমাতা জিজাবাঈ—

> জিজাবাঈ বন্দী! কে নয় শিববা? দুর্ভাগ্য এই দেশের কারাগারের
> ভিতরে বা বাইরে যে যেখানেই রয়েছে সে-ই লাঞ্চনা সইছে,

নির্যাতন ভোগ করছে। সন্তান তুমি পিতার মুক্তির জন্য স্বতঃই ব্যকুল হয়ে উঠবে 'কিন্তু ভুলো না, তুমি শুধু সন্তান নও,- তুমি রাজা। প্রজাসাধারণের মুক্তির ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে জাতির উদ্ধারে এগিয়ে গেছেন শিবাজী কৌশলে মোগল সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে পিতাকে আদিল শাহের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শিবাজীর প্রত্যুপন্নমতিত্ব এবং কৌশলের অসাধারণ সূক্ষ্মতা ধরা পড়েছে। শিবাজীর এই মিত্রতা স্থাপন ইতিহাসগত ভাবে সত্য। মোঘল যুগের ঐতিহাসিকরাও এ তথ্য স্বীকার করেছেন। এই নাটক শিবাজী পেশোয়াকে সেই ঐতিহাসিক চুক্তি বা বন্ধুত্বের কথা বলেছেন- পিতাকে আদিল শাহেব কবল থেকে রক্ষা করতে হলে তাঁর প্রথম কর্তব্য মুঘলদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন, কেননা বিজাপুর মুঘল ও শিবাজী উভয়ের কাছেও একই ক্ষত। তাই শিবাজী বলেছেন- "আমি, মুঘলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করব। আপনি আজই আগ্রায় সম্রাট সাজাহানের কাছে লোক পাঠান। বন্ধুত্বের বিনিময়ে আমি চাই কেবল পিতার মুক্তি অন্য কোন শর্ত আমার নেই। বিজাপুর আমাদের যেমন শত্রু, মুঘল ও তেমনি। কিন্তু বিজাপুর দুর্বল, তাই তার শক্তি আগে হরণ করতে হবে। তার পর দেখা যাবে, রাজপুতানার গৌরবহারী, সমগ্র ভারত বিজয়ী মুঘল কত শক্তি ধরে।" এই সন্ধি যখন হয় তখন মুঘল সম্রাট ছিলেন ঔরঙ্গজেব ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে যে চুক্তি হয়েছিল সেই সন্ধির কথাই সম্ভবত এনেছেন নাট্যকার। কেননা এই বছর শিবাজী ও বিজাপুর সুলতানের মধ্যে সন্ধি হয়েছিল এবং মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পিতা ও ভ্রাতাদের হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। এর পূর্বে ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সাজাহানের বশ্যতা স্বীকার করে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা। আর শিবাজী তোরনদূর্গ জয় করে ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। নাটকের প্রথম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যে পথ চলিত সাধারণ লোকের কথপোকথনের মধ্যদিয়ে শিবাজী ছিলেন ছদ্মবেশী। ছদ্মবেশ ধারণের জন্য মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ব্যর্থ হয়েছিলেন শিবাজীর প্রতি কূটনীতি করতে। আগ্রা দূর্গ থেকে ঔরঙ্গজেবের চোখে ধূলোদিয়ে পালিয়ে ছিলেন। এই কূটনৈতিক ছদ্মবেশী শিবাজী। পথ ...পথচারীর কথায় সে সত্য উদঘাটিত হয়েছে।

"২য়। লোকটা শুনেছি বহুরূপী।
৩য়। বহুরূপী কি রকম
২য়। একটিবার দেখে স্বরূপ বোঝা যায় না। কখনো কালো, কখনো ফর্সা,
আবার কখনো বা একবারে নবজলধরশ্যামা!
১ম। আবার দূর্গের পর দূর্গজয় করছে, তাই ওই বহুরূপী সেজেই।"

সুতরাং নাট্যকারের মর্মে পরিচ্ছন্ন ইতিহাস চেতনা ও বোধ ক্রিয়াশীল ছিল, সেই সঙ্গে ইতিহাসের নিবিড় পাঠ এই সব জনশ্রুতিময় অথচ ঐতিহাসিক স্বীকৃত ইতিহাসের তথ্যকেও নাটক এনে নাটকের ঐতিহাসিক পরিধি বৃদ্ধি করেছে। আফজল খাঁ আরও একটি ঐতিহাসিক চরিত্র নাট্যকার আফজল খাঁর সঙ্গে শিবাজীর দ্বন্দ্বের ইতিহাসও সর্বজনবিদিত। শিবাজী আফজল খাঁকে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্যটিও নাট্যকার নিষ্ঠাপূর্ণভাবে আলোচনা করেছেন। শিবাজী যে 'বাঘনাঘ' 'বিচ্ছুয়া' নামক অস্ত্রদ্বারা আফজাল খাঁকে হত্যা করেছিল। সেই দুই অস্ত্রের ও উল্লেখ করেছেন নাট্যকার।

শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে শিবাজীর আরেকটি যুদ্ধ হয়েছিল পুনা দখলকে কেন্দ্র করে। নাট্যকার সে ঐতিহাসিক তথ্যটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্রন্থন করেছেন এই নাটকে। শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণে হাতের একটি আঙুল হারিয়ে আহম্মদনগরের পথে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন শায়েস্তা খাঁ। পুনা জয়ের সেই চমকপ্রদ ইতিহাস প্রায় অবিকৃতিরূপে তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

একদিকে শিবাজীর শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত ঔরঙ্গজেব হিন্দু জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দাক্ষিণাত্যে পাঠান। কৌশলে সন্ধির নামে শিবাজীকে বন্দী করার প্রয়াস করেন সম্রাট আলমগীর। কিন্তু প্রবল বুদ্ধি ও চাতুর্যে ঔরঙ্গজেবকে ফাঁকি দিয়ে শিবাজী পালিয়ে আসেন এবং মারাঠা শক্তিকে শক্তিশালী করে মুঘলদের প্রতিশোধ নেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'গৈরিক পতাকা' নাটকে প্রায় সকল তথ্যই ইতিহাস থেকে আহরণ করেছেন। কল্পনা ও ইতিহাসের তুল্যমূল্য প্রয়োগ করেছেন এই ভাবে দেখা যায় নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটকের সামগ্রিক শর্ত তাঁর এই নাটকটিতে লক্ষ্য করেছেন এবং সাফল্যের সঙ্গে তা উত্তীর্ণ হয়েছেন।